সমকাল

তারিখ: 25 APR 2017
পৃষ্ঠা: ৯ কলাম: ২

বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার স্বরূপ

মানবসম্পদ

আমিরুল আলম খান

সাবেক চেয়ারম্যান, যশোর শিক্ষা বোর্ড

আধুনিক যুগে কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার জয়জয়কার। এশীয় সমাজে বংশপরম্পরায় বিশেষ কারিগরি দক্ষতা অর্জন ও পেশাজীবী হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ সুপ্রাচীন প্রথা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণত ব্যবহারিক, সামান্য কিছু তাত্ত্বিক। আর্য ভারত থেকে মুঘল ভারতে ব্যবহারিক শিক্ষা এতই উন্নতমানের ছিল যে, জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার রেল ও শিল্প উৎপাদনে তার ব্যাপক ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বের শিল্প-বাণিজ্যের সিংহভাগ ছিল প্রাচ্য, বিশেষত ভারত, চীন ও দূরপ্রাচ্যের দখলে। ইউরোপীয় বাজারে এশীয় পণ্যের তালিকা বেশ লম্বা; তবে তিনটি আইটেম খুবই উল্লেখযোগ্য– ভারতের সুতি বস্ত্র, ইন্দোনেশিয়ার মসলা, বিশেষ করে গোলমরিচ আর চীনের চা। অন্যদিকে পারস্য, আরব, তুর্ক সাম্রাজ্যও সেকালের উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করত। ইউরোপে এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত ইতালি। তারা পশ্চিম ইউরোপকে সে বাণিজ্যে কোনো ছাড় দিত না। মূলত, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভাস্কো ডা গামার ভারত আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত পারস্য, আরব, তুর্ক ও ইতালীয় বণিকরা। দূরপ্রাচ্যের মসলা ব্যতীত ইউরোপের স্বাদহীন খাদ্যে ইউরোপীয়রা ছিল নাকাল। বস্ত্রের জন্য তারা নির্ভরশীল ছিল ভারত, বিশেষত বাংলা ও চীনের ওপর। ছিল চীনামাটির তৈরি তৈজসপত্রের বিপুল চাহিদা। ভারত আবিষ্কারে তাই আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলীয় বণিকরা, বিশেষত স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক মরিয়া হয়ে উঠেছিল। একের পর এক নৌ-অভিযান চালনায় তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং তারই ধারাবাহিকতায় প্রথমে স্পেনের রানীর পৃষ্ঠপোষকতায় ইতালীয় সমুদ্র অভিযাত্রী, ভূগোলবিদ ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে নতুন পৃথিবী আমেরিকা; পরে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষের সাগরপথ আবিষ্কারে সমর্থ হন।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বিশ্বের সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী দেশ বাংলার পরাজয় ও মুঘল দরবার থেকে কোম্পানির বাংলার দেওয়ানি লাভ, বাংলায় কোম্পানির নজিরবিহীন লুণ্ঠন, ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার ও পরবর্তীকালে কল-কারখানা ও জাহাজে তার ব্যাপক ব্যবহার ইউরোপে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব অনিবার্য করে তোলে। কিন্তু প্রাচ্যে তা স্বৈরতান্ত্রিক অচলায়তন, বিলাসিতা ও বিজ্ঞানচর্চায় অনীহা, মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার না জানা, সর্বশেষ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ইত্যাকার কারণে এশিয়ায় যন্ত্র ও শিল্প বিপ্লব সম্ভব হয়নি।

ব্রিটিশ-পরবর্তী স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানে কারিগরি শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং দক্ষতা ও পণ্য উৎপাদনে তা প্রভূত উন্নতি সাধন করে। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন সিনিয়র হাই স্কুলে কারিগরি বিষয় অন্তর্ভুক্তি এবং ১৯৫৯ সালে শরীফ কমিশন সুস্পষ্টভাবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালুর সুপারিশ করে। জাতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শরীফ কমিশন রিপোর্ট কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নে সহায়তা করা ও শিক্ষাকে একটি উৎপাদনমুখী কার্যক্রম এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় বিনিয়োগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। মাধ্যমিক স্কুল কারিকুলামে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কতিপয় ঐচ্ছিক বিষয়সহ গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যিক বিষয় অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করে। আজও এ রিপোর্টকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা রিপোর্ট হিসেবে গণ্য করা হয়। শরীফ কমিশন ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, সম্প্রসারিত সিলেবাস, তিন বছর মেয়াদি পাস ও অনার্স কোর্সের সুপারিশ করে। এই সুপারিশকে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা সংকোচনের লক্ষ্যে এক গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে ১৯৬২ সালে দেশব্যাপী আইয়ুববিরোধী ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শরীফ কমিশন সুপারিশ এক দু'ধারী খঞ্জর তুলে দেয়। ছাত্র আন্দোলনের মুখে গোটা সুপারিশ পরিত্যক্ত হয়। ১৯৬৪ সালে বিচারপতি হামুদুর রহমান ছাত্র সমস্যা ও ছাত্রকল্যাণ বিষয়ক কমিশন রিপোর্টও ছাত্র আন্দোলনের মুখে বাতিল হয়। পরবর্তী সব শিক্ষা কমিশন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও এ ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন আশাব্যঞ্জক নয়।

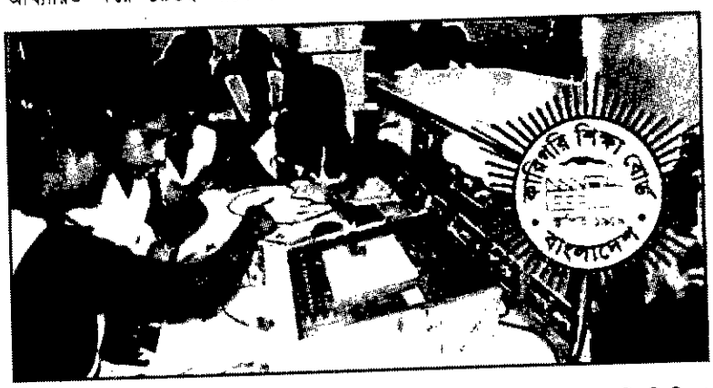

শরীফ কমিশন বাতিল করা হলেও সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে কিছু সুপারিশ বাস্তবায়ন করে। নতুন তিনটি শিক্ষা বোর্ড (কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর), তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় (চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর ও ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপন, আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে ১৯৬২ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ, ১৯৫৭ সালের আইনবলে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পূর্ব পাকিস্তানে অন্তত ১৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন এ দেশে কৃষি, প্রকৌশল, কারিগরি শিক্ষাসহ সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটায়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি অর্থে প্রতিষ্ঠিত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১৭টি, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ৪৯টি। এ ছাড়া বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে ৭৪টি। আরও অনেক প্রতিষ্ঠান কারিগরি, প্রকৌশল শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত।

বিগত চার দশকে বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা শহরে সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল-কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। কারিগরি শিক্ষার বিপুল চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে '৯০-এর দশকে বেসরকারি খাতে কারিগরি শিক্ষাদানকে উৎসাহিত করা হয়। আদতে তা ছিল শিক্ষা খাতের বাণিজ্যিকীকরণের একটি আন্তর্জাতিক পথরেখা বাস্তবায়ন। সে ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। '৯০-এর দশক থেকে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের নামে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনে গ্রাম-গঞ্জে অসংখ্য সাধারণ স্কুল-কলেজে যেসব কারিগরি ট্রেডে পাঠদান করা হচ্ছে, তা স্রেফ সার্টিফিকেট বিতরণ ছাড়া কিছু নয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্টিফিকেট বাণিজ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এই শিক্ষানীতি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্তরভিত্তিক জাতীয় দক্ষতামান ১, ২, ৩ ও ৪ অর্জনের রূপরেখা প্রণয়ন করে। সুপারিশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ : ১২ নির্ধারণ করা হয়। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রতি উপজেলায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, লেদার ইনস্টিটিউটসহ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সুসংহত করার লক্ষ্যে দেশে এ ধরনের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন করা এবং বোর্ডকে অধিকতর শক্তিশালী করা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান ও জনবল বৃদ্ধি, যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক-প্রশিক্ষক নিয়োগের অঙ্গীকার করা হলেও বাস্তব অগ্রগতি সামান্যই। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ দেশে একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী যদিও দেশে কারিগরি শিক্ষার্থীর সংখ্যা গত এক দশকে তিন থেকে ১৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু এর ৮০ ভাগ শিক্ষার্থীই ন্যূনতম ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করে না। ফলে দেশে-বিদেশে বিপুল চাহিদা সত্ত্বেও আমাদের কারিগরি শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়ে চাকরির সন্ধানে ঘুরে ঘুরে মরে। মাত্র একটা কারিগরি বোর্ডের পক্ষে বিপুল সংখ্যক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান করা সম্ভব নয় জেনেও দেশে সাধারণ শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েছে, আর উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে কারিগরি শিক্ষা। দেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন নিবেদিতপ্রাণ, কর্মঠ শিক্ষকমণ্ডলী। এ দেশে যদি আটটি সাধারণ বোর্ড দরকারি মনে হয়, তবে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড স্থাপন উচিত অন্তত দশটা এবং উপযুক্ত, সৎ, নিষ্ঠাবান শিক্ষক-প্রশাসক দিয়ে সেসব বোর্ড পরিচালনা করা উচিত।

আমাদের কৃষি, গার্মেন্ট, প্রবাসী আয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়সহ শ্রমঘন কর্মক্ষেত্র নিরক্ষর থেকে মাধ্যমিক পাস নারী-পুরুষের অবদানের ফসল। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিত বলতে তাদের বোঝানো হয়, যারা স্রেফ কেরানিগিরি শেখে। তার চেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে, সে কেরানিগিরিতেও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারীরা লজ্জাজনকভাবে ব্যর্থ। তারা শ্রমবিমুখ, আত্মপরায়ণ এবং সমাজের জন্য ক্রমশ বোঝা হয়ে উঠছে। তাদের এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী এই নবীন প্রজন্ম নয়; দায়ী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের উচ্চশিক্ষার শীর্ষ কেন্দ্রগুলো গবেষণা ও জ্ঞান সৃজনের চেয়ে দলাদলি, মাস্তানি, দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। একই অবস্থা কলেজগুলোরও, যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব দক্ষ কর্মক্ষম শ্রমশক্তি গড়ে তোলা। কিন্তু সেখানেও রাজনীতি, দলাদলি, মাস্তানি ও দুর্নীতি সর্বগ্রাসী।

শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তিসহ আধুনিক প্রযুক্তির যৌক্তিক ব্যবহারে আমরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছি। দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ভারত ও নেপালের পরে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। ইন্টারনেট ব্যবহার সক্ষমতায় বিশ্বের ৫৮টি উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান গত বছরের ৩৩তম থেকে ১৩ কদম পিছিয়ে ২০১৭ সালে ৪৬তম। এই চিত্র ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের ঘোষিত প্রত্যয়ের চেয়ে কয়েক যোজন পেছনে আমাদের অবস্থানকে নির্দেশ করে। এর অন্যতম কারণ, আমরা যত বেশি প্রচারপটু, তত কম দক্ষ ও কর্মনিষ্ঠ।

আধুনিক প্রযুক্তির যৌক্তিক ব্যবহারে আমাদের পশ্চাৎপদতার মূল কারণ নিহিত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থায়। বহু ক্ষেত্রেই আমাদের শিক্ষা আইন দুর্বল, কখনও কখনও সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, এমনকি সাংঘর্ষিক। কিন্তু গায়ের জোরে আমরা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছি।